ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 11. Number 01. March 2015

রবীন্দ্রদর্শনে মানবতাবাদ: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

সোহানি শারমিন [*]

Abstract: Man is at the centre of Tagore's humanism. As a humanist Tagore believed in the essential unity of man and the universality of the mind. Tagore says in his 'Conversations with Einstein' that the truth of the Universe is human truth, æhe means that he is interested in concrete human beings and not in abstract man. According to Tagore man is the measure of everything. Tagore believed that God resides in the heart of man. To hate a man is to hate the God in him. So humanism is the hall mark of the total Tagore.

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)-এর জীবন এক মহাজীবন। শুধু তাঁর সৃষ্টির বিপুলতা ও কাজের জন্য নয়,সামগ্রিকভাবেই তাঁর কর্ম ও জীবন সাধনার তুলনা প্রাচ্যে বিশেষ নেই। একজন আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসিক বিকাশ, জীবনদর্শন ও মানবতাবাদে তাঁর স্থান অতি ছোট পরিসরে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গান, নৃত্যনাট্য, গীতিকাব্য, নাটক বা কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় না। তাঁর কবিতা, গান, নাটক উপভোগ করা এক জিনিস, কিন্তু তাঁর বাণী উপলোব্ধি করার জন্য তাঁর দর্শনচিন্তা ও জীবনদর্শন আলোচনা করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনার অনেক বিষয় আছে, আছে বিভিন্ন দিক। তাঁর বিচিত্রসত্ত্বার যেকোনো একটি দিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হতে পারে। এখানে আলোচনার বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ। রবীন্দ্রনাথের দর্শন মানবতাবাদী মরমি দর্শন।তাঁর জীবনবোধের মূলে ছিল মানব বিশ্বাস ও কল্যাণকামিতা। তাঁর মানবতাবাদ কোনপ্রকার আধ্যাত্মিক কিংবা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা সংকুচিত কিংবা কুণ্ঠিত হয়নি। তাঁর মানবতাবাদের মূলে ছিল বস্তুজ্ঞান, কর্মশক্তি এবং আত্মশক্তির সমন্বিতরূপ। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সম্মিলিত মানুষের ঐক্যে ও মানবধর্মে বিশ্বাসী। তিনি বলেছেল- My Religion is human religion-সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মানবমৈত্রী ধর্মের উপাসক। তাঁর ধর্মকে যদি কোন নাম দিতে হয় তবে তা মানবধর্ম। অহিংসা, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সততা, ইত্যাদি মানবিক গুনাবলী বুদ্ধদেব ও মহাত্মা গান্ধীর

দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রচারিত আদর্শ। রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শকে অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা মানুষকে মহিমাময় হওয়ার দীক্ষা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কর্মের মধ্যেই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত উপলব্ধি করেছেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি ও বিকাশ ক্ষমতাকে দিয়েছেন অধিক মর্যদা। তাঁর মতে মানুষ আত্মশক্তির বলেই পূর্ণতা অর্জন করে। রবীন্দ্রসাহিত্য ও দর্শনে এই মহিমার কথা নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানেই তাঁর মানবতবাদী দর্শন অমূল্য। মানুষের জীবভাব এবং

[*] এম.ফিল. গবেষক, আই.ই.আর., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

বিশ্বভাবের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা। এক গভীর বিশ্বাস থেকে তিনি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানবতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অবিচল, নির্দ্বন্দ্ব। যুক্তি দিয়ে তাঁর দর্শন ও মানবতাবাদকে বিচার করতে গেলে অনেক কিছু অসার বলে বিবেচিত হবে কিন্তু একটি সংঘাতহীন শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ নির্মাণের লক্ষে তার প্রয়োজন অসামান্য।

রবীন্দ্র মানবতাবাদ

সাধারণত মানবতাবাদ শব্দটি এমন এক দার্শনিক চিন্তা ও ধারণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যা মানুষকে সকল কিছুর কেন্দ্র ও মানদ হিসেবে গণ্য করে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে মানবতাবাদের ধারনাটি প্রথমে একটি সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, চিন্তাগত ও শিক্ষাভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে বিদ্যমান ছিল যা পরবর্তীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এ কারনেই এই চিন্তাধারা সকল দার্শনিক, নৈতিক, শৈল্পিক ও সাহিত্যিক বিষয়কে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। মানবতাবাদ বলতে মানবকেন্দ্রিক দর্শনকে বুঝায়। এই দর্শনে মানুষের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানুষ অন্য কোন কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয় বরং অন্য সবকিছুই মানুষের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ নিজেই তাঁর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। আত্মোন্নতির দ্বারা মানুষ নিজের, সমাজের, বিশ্বজগতের কল্যাণ সাধন করতে পারে। কাজেই মানবতাবাদ বলতে এমন এক দার্শনিক মতবাদ বুঝায় যা মানুষের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।[১]

মানবতাবাদের দুটি ধারা পরিলক্ষিত - এর একটি আধ্যাত্মিক এবং অন্যটি বস্তুবাদী। রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদের আধ্যাত্মিক ধারার সমর্থক। রবীন্দ্রদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ, এক কথায় রবীন্দ্রদর্শন মানুষের পর্যালোচনা, 'এ স্টাডি অব ম্যান'।[২] রবীন্দ্রদর্শনে সত্য হচ্ছে মানবিক সত্য আর ধর্ম হচ্ছে মানুষের ধর্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে সত্য, ধর্ম, বিশ্বজগৎ কোনকিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাঁর এই মনুষ্যত্বের সাধনা দেশকাল বা বিশেষ ধর্মীয় গি তে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিলো সমগ্র মানুষের কল্যানে। মানুষের জীবভাব এবং বিশ্বভাবের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা। এক গভীর বিশ্বাস থেকে তিনি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মানবতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অবিচল, নির্দ্বন্দ্ব। যুক্তি দিয়ে তাঁর দর্শন ও মানবতাবাদকে বিচার করতে গেলে অনেক কিছু অসার বলে বিবেচিত হবে কিন্তু একটি সংঘাতহীন শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ নির্মাণের লক্ষে তার প্রয়োজন অসামান্য।

সব মানুষের ভেতরে একটা বিশিষ্টতা আছে, মানুষের এই বিশিষ্টতা বা সারসত্ত্বা দিয়েই দেশ-কাল অতিক্রম করে গড়ে উঠে এক মানবসত্ত্বা।রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-এই মানব সত্ত্বা হচ্ছে 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব'।[৩] রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলে ছিল সমগ্রতাবাদী মানবতত্ত্ব। তিনি মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন সমগ্র দৃষ্টিকোন থেকে। তাঁর মানবতাবাদ কোন প্রকার আধ্যাত্মিক কিংবা ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা সংকুচিত কিংবা কুণ্ঠিত হয়নি। তাঁর মানবতাবাদের মূলে ছিলো বস্তুজ্ঞান, কর্মশক্তি এবং আত্মশক্তির সমন্বিতরূপ। মানুষের জীবভাব এবং বিশ্বভাবের সমন্বয় সাধনই ছিলো তাঁর জীবন দর্শনের মূলকথা।

রবীন্দ্রনাথ বলেন-সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে উঠতে না পারলে মানব সত্ত্বার বিকাশ ঘটবে না। মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে এবং অপর মানুষকে জানতে অন্তরে এক ধরনের তাগিদ অনুভব করে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যর আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে'।[৪]মানুষের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে এক সে 'আমি'তেই সীমাবদ্ধ থাকে,আর অন্য এক 'আমি হলো সর্বত্র ব্যাপ্ত'। আমরা যখন ছোট 'আমি'কে আঁকড়ে ধরি তখনই আমরা মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হই। এই ছোট 'আমি' অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যেই।[৫] রবীন্দ্রনাথ যে 'আমির' কথা বলেছেন তা সর্বজনীন মানুষ। এই মানববোধ কেবল তাঁর কাব্যে নয় বরং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শনের কেন্দ্রস্থ সত্য, তাঁর অন্তরে অন্তরে অবিরল প্রাণ প্রবাহের মতো বহমান।

রবীন্দ্রনাথ জগতের সত্য আর মানুষের আত্মিক সত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন আর তিনি এটা করেছেন জ্যোতির তত্ত্ব দিয়ে। তাঁর বিশ্বাস 'জড় এবং চৈতন্য' দুইই কোন এক আদি মহাজ্যোতির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র।[৬] মহাজ্যোতির প্রকাশে প্রথম হলো জড়শক্তি। তবে জড়শক্তির প্রকাশ স্থুল প্রকাশ ও মহাজ্যোতির সূক্ষতর প্রকাশ প্রাণে আর চৈতন্যে। জগতের মধ্যে আমরা দুটি ব্যাপার দেখতে পাই-একটা কাজের ও অন্যটা ভাবের প্রকাশ। কাজের জগতকে আমরা সমগ্ররূপে উপলব্ধি করতে পারি না, কেননা কাজের জগৎ সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান পাই সেই জ্ঞান হল আংশিক জ্ঞান। অন্যদিকে ভাবের প্রকাশ অপরোক্ষানাভূতির প্রকাশ। ভাবের প্রকাশ কোনো বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয় না। জগতের অন্তরে যে রস আছে সেই রস হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং হৃদয়ের রসকে বাইরে টেনে এনে বস্তুজগতকে অভিষিক্ত করে।[৭] কাজের জগতকে সর্ম্পূভাবে উপলব্ধি করতে না পারার আরেকটি কারণ হলো -যে মনের সাহায্যে আমরা কাজের জগতকে জানবো, সেই মনও কাজের জগতের অন্তর্ভূক্ত। মনন শক্তির সাহায্যে আমরা যে কাজের জগতকে জানি সেখানে জ্ঞাতার বস্তুজগতকে জানার আগ্রহ আছে, কিন্তু সেখানে সত্য আত্ম প্রকাশের জন্য উন্মুখ নয়। কিন্তু ভাবের জগতে অনুভূতির রাজ্যে আত্মপ্রকাশের উন্মুখতা আছে। কাজের জগতে খ-কে খ-র সাথে যুক্ত করে একটি সমগ্রের সৃষ্টি করা হয়। আবার সেই সমগ্রকে ভিন্ন একটি সমগ্রকের সাথে যুক্ত করে দেখা হয়। রবীন্দ্রনাথ একটি কথা বারবার বলার চেষ্টা করেছেন- খ-কে খ-র সঙ্গে যুক্ত করলে অখ- সত্য পাওয়া যায় না। কেননা অখ- সত্য নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক। অনুভূতির মাধ্যমে সত্যকে সহজেই পাওয়া যায়।[৮]

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যকে সমর্থন করেননি, তিনি সংসার ছেড়ে পর্বতের গুহায় কিংবা নির্জনস্থানে জীবন সাধনা গ্রহণ করেননি। এরকম জীবন স্বাভাবিক হাসি- কান্না, আশা-নিরাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এতেমানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। মানুষের সহজাত শুভ ও সুন্দর প্রবণতাগুলোকে তিনি অনুশাসনের নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর জীবনদর্শনের মূলে ছিল মানুষের সর্বাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ বিকাশ। স্বাভাবিক ও গতিশীল জীবনবোধই তাঁর কাম্য ছিলো ।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবদী ধারায় আরো বিশেষ যে দিকটি লক্ষ্য করা যায় তা হলো-তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।এর একটি হলো বৌদ্ধ মানবতাবাদ। রবীন্দ্র মানবতাবাদে আমরা বৌদ্ধ মানবতাবাদ দেখতে পায়। অল্প বয়স থেকেই তাঁর এই বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয় তাই তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন প-িতের কাছ থেকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনে দু'জন প-িতের সাহচার্য লাভ করেছেন। একজন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যজন তাঁর বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরা উভয়ে প্রাচীন ভারততত্ত্বে প-িত ছিলেন । রাজেন্দ্রলাল বৌদ্ধ দর্শনে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু দর্শনে প-িত। অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ, ইতিহাসবিদ ও বৌদ্ধশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শ আসেন।[৯] সুকুমার সেন লিখেছেন : বৌদ্ধসাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলতে যদি কেউ থাকে তবে তা রবীন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো রাজেন্দ্রলাল- দীক্ষিত শিষ্য বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে ভালো গবেষণা করেছেন জানি, কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে যে সাহিত্য রস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেননি, না এদেশে, না বিদেশে।[১০]

যে ভারতবর্ষ বিশ্বকে মানবতার বাণী শুনিয়েছিল সেই ভারতবর্ষেই একদিন এল অনৈক্য ও বিবেধের সামাজিক ব্যাধি। কালপ্রবাহে বৌদ্ধ মানবতাবাদ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় ভারতবর্ষের মানুষের ক্ষতি হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন।

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রগুলোতে যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বাসের কোন অভাব ছিলনা, তবু শাস্ত্রনিরপেক্ষ ও ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদী তত্ত্বজ্ঞানই তাঁকে বেশী আকর্ষণ করত। কারন ঐ সব তত্ত্বজ্ঞানের বাহন ছিল কবিতা ও সংগীত। সেইগুলো রচিত হতো সাধারণ মানুষের ভাষায় এবং তা সহজেই স্পর্শ করত সাধারণ

মানুষকে। তাই তাঁর মতে, ভারতবর্ষে দর্শন শুধু প-িতদের সম্পদ নয়, সাধারণ মানুষের প্রিয় বস্তু ও চর্চারও বিষয়।[১১]

ভারতীয় ঐতিহাসিক সমাজ ব্যবস্থায় "অস্পৃশ্যতা" এমন এক সামাজিক সংস্কার, যার ফলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা, হিন্দু সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়কে এবং হিন্দু সমাজ বহির্ভূত সকল লোককে অপবিত্র ভেবে স্পর্শের অযোগ্য জ্ঞান করে এবং তাদের কাছ থেকে সমস্ত প্রকার সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে চলে। প্রাচীন হিন্দু সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এই প্রথা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে সুনির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে জড়িত থাকত এবং সামাজিক মর্যদার ক্ষেত্রে উচ্চতা - নীচতার অনুক্রম মেনে চলত। উচ্চ-নীচের এই ধারণা ক্রমেই কোন বর্ণকে শ্রেষ্ঠ এবং কোন বর্ণকে নিকৃষ্ট ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। কালক্রমে চার বর্ণের নারী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনে জন্ম নেয় অনেকগুলি সংকর বর্ণ। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী স্পৃশ্য কোনো সদস্য অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর স্পর্শ করা জল ব্যবহার করে না এবং অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্যের জন্য স্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। এদিক দিয়ে মন্দিরে দেবতার সামনে রক্ষিত মঙ্গলঘট দুই দিক দিয়েই স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার মতো বস্তু। শুধু তাই নয়, মঙ্গল ঘটকে এতটা পবিত্র মনে করা হয় যে, পূজারি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা স্পর্শ করার বিধান নেই। এমন চরমভাবে বাঁচিয়ে চলা মঙ্গল ঘটকেই তিনি স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেন। তারপর তিনি সকলকে তা স্পর্শ করিয়ে অস্পৃশ্যতার ধারণাকেই শুধু অস্বীকার করেননি বরং অস্পৃশ্যতা তত্ত্বের বিপরীত প্রয়োগ ঘটিয়ে অস্পৃশ্যতার অমানবিকতাকের মূর্ত করে তোলেন। এরই প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ তার শান্তিনিকেতনে অস্পৃশ্যতাবিরোধ কর্মসূচি শুরু করেছেন। তিনি অস্পৃশ্যতাকে সমকালীন সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে তুলে ধরেন এবং সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতাকে দূর করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ কতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্কার সমিতির কর্মকা- থেকে তা আঁচ করা যায়। শান্তিনিকেতনের সকল শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিবেশী গ্রামগুলোতে গিয়ে নিয়মিত প্রচার চালিয়ে যেত। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামে সভা, ধর্মসভা, কীর্তন ও সর্বজনীন ভোজন-উৎসবের আয়োজন করা হতো। আর ভোজন উৎসবের আয়োজক ছিলো গ্রামের অধিবাসীরাই। গ্রামের ডোম, বাগদি, মেথর, মুচি সকলে একসাথে খাবার খেত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা- শান্তিনিকেতনের ছাত্র-শিক্ষক-আমন্ত্রিত হিন্দুরা একসাথে খাবার খেতে বসে। অনেকে দুইজন অস্পৃশ্যের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় বসে। এভাবে জাত-পাতের ভেদ একাকার হয়ে যায়।[১২] সাধারণ সভাগুলোতে বক্তৃতার পাশাপাশি অস্পৃশ্যতা বিরোধী প্রাসঙ্গিক কিছু চলচ্চিত্র দেখানো হতো। আর ধর্মসভার আলোচনায়, শাস্ত্রের সেই দিক তুলে ধরা হতো যেখানে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।

বাঙালির জীবনসাধনা ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের মানুষের থেকে আলাদা। শাস্ত্রের কড়াকড়ি বাঙালি সাধকদের ভালো লাগেনি। তাদেঁর পছন্দ সমন্বয় মানবপন্থী ধারা। বাঙালির এই মানবতাবাদী দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও বিবেচনা ছিল খুবই স্পষ্ট। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম-দুই ভারতবর্ষের ধর্ম। তাই রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শন আলোচনা করতে গেলে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক চিন্তাভাবনাকে সামনে আনতে হবে।

বর্হিজগতের কোন অস্বাভাবিক নির্মম ঘটনা অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ-শোক মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন সংবেদনশীল ও ভাবুক প্রকৃতির মানুষের অর্ন্তজগতে বড় পরিবর্তন এনেছিল। কুড়ি শতকের শুরুর কয়েকটি বছর ছিল তাঁর জীবনের তেমন একটি সময়। রবীন্দ্রনাথের জন্য তা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিস্থল। ঐরকম অবস্থায় ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে চিন্তাশীল মানুষ হয় খুব বেশী বস্তুবাদী হয়ে যান, অথবা মরমি আধ্যাত্মবাদী হয়ে ওঠেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর প্রিয়জন ও ঘনিষ্ঠ জনের অনেকগুলো মৃত্যুশোক তাঁর মনোজগতে আনে নতুন পরিবর্তন। ফলে তিনি মরমী মানবতাবাদ চর্চা শুরু করেন।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শন আলোচনা করতে গেলে বাংলার বাউল ও পল্লী ভাবুকদের চিন্তাধারা আলোচনা করা দরকার। বিশেষকরে লালনশাহ, কারন বেদ-উপনিইষদের শিক্ষা শুধু নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনও নয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির ও লোকায়ত দর্শনের প্রভাবও তার ওপর গভীর। নিরক্ষর বাউলদের ভাবসম্পদ থেকেও তিনি সত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বাউলদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এতটাই ছিল যে নিজেকে 'রবীন্দ্রবাউল' বলতেও সংকোচবোধ করেননি। কোন কোন মরমি ভাববাদি সম্প্রদায়ের মতো বাউলরাও বিশ্বাস করেন, মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা বাস করে। কাজেই নিজেকে চিনলেই, নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটাতে পারলেই পরমাত্মার সান্নিধ্য অর্জন সম্ভাব। বাউলদের এই সাধনার সাথে রবীন্দ্রনাথের আত্মার সাধনার সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য মরমির মতো বাউলদেরও ধারণা আল্লাহ তাঁর নিজের মত করে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রতক্ষ। এই দুয়ের মধ্যে আর কেউ নেই তবে আল্লাহকে যেহেতু চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না , সুতরাং তিনি অচেনা। বাউলদের সাধনা অচেনাকে চেনা , এই অচেনাকে চেনার সাধনা রবীন্দ্রনাথেরও, তবে বাউলদের সব হেঁয়ালি বা রহস্যময় কথা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি, কেবলমাত্র তাঁদের উদার মানবতাবাদী বাণী তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। বাউল, লোককবি ও সুফি সাধকদের উদার মানবতাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম অনেক উপাদান গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কথা স্বীকার করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনায় সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। বাংলা ও বাংলার বাইরে ভারতের নানা উৎস থেকে, প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন মতবাদের ফুল থেকে মধু আহরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে কোন একটি মাত্র মতবাদ তথা একটি মাত্র ধর্ম সাধনা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই বিচিত্র সূত্র থেকে অকৃপণভাবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তিনি মানবতাবাদী সত্যের সন্ধান করেছেন।[১৪] তিনি মনে করতেন, মানবপন্থী বাংলাদেশে এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নারী। তিনি সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে সবসময় গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করতেন। মানুষের পৃথিবী যে নারীরও পৃথিবী এ বিষয়টিকে সকলের সামনে তুলে এনেছেন। যে সব যৌথ পরিবাবে বাল্যবিবাহ দেয়া হতো তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ব্যথিত হতো। তিনি কখনো চাইতেন না- নারীরা শুধুমাত্র সংসারের কাজে সময় ব্যয় করে নিজেদের প্রতিভাবে বিনষ্ট করুক। মুখে দেবী আর কাজে দাসী হিসাবে নারীকে মূল্যায়ন করার যে কুপ্রথা তৎকালে প্রচলিত ছিল সেই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি কুঠার হাতে নারী জাতির পক্ষে দাড়িয়েছিলেন। তাঁর নারী প্রেমিক মানসলোক শিঘ্রই উপলব্দি করল যে শুধু সমাজ সংস্কারের মাধ্যমেই নারী জাতিকে তার কাঙ্খিত আসনে বসানো যাবে না। নারীদের অবস্থার উন্নতিতে তাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। তাই তিনি নারী শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পুরুষ প্রধান সমাজে নারীরা যে অবহেলিত, উপেক্ষিত, সমাজের কাছ থেকে অত্যাচার ও অবিচার যে তাদের নিত্য পাওনা এ কথা তিনি জানতেন। বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর পছন্দ/ অপছন্দ কে গুরুত্ব দেয়া হতো না। অর্থই ছিল পাত্রের একমাত্র যোগ্যতা। তাই বৃদ্ধ, রুগ্ন সকলেই অর্থের বিনিময়ে সুপাত্র রূপে বিবেচিত হতো। রবীন্দ্রনাথ এই দূর্ভোগের পিছনে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতাকেই দায়ী করেছেন। তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে নারী জাতিকে যদি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় তাহলে তাদের দুঃখ-দুর্দশা নিরসন সম্ভব। বস্তুত তিনি তৎকালীন সমাজে ভারতীয় নারীর যে করুণ অবস্থার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন এবং নারী জাতির প্রতি যে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন তার কোন তুলনা হয় না। নারীজাতির প্রতি যাবতীয় হৃদয়হীন অত্যাচার, অনাচার ও অবিচারের অবসান ঘটিয়ে তাকে পুরুষের উপযুক্ত সহধর্মিনী করে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। এই নারীপ্রেম ছিল তাঁর মানবকেন্দ্রিক জীবনদর্শনের এক উল্লেখ্যযোগ্য দিক।

উপসংহার

বাঙালি জাতির ইতিহাসের একটি শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চিন্তাশক্তি এতটাই প্রসারিত ছিল যে, তা দার্শনিক ধ্যান-ধারণার সমতুল্য।তাঁর মানবতাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর জীবনকর্ম,সাহিত্য ও শিল্পসাধনার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের এই সাধনা কেবলমাত্র নিজের আত্মার শান্তির জন্য নয় বরং বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণই তাঁর লক্ষ্য। তাই তাঁর দর্শন মানুষের মুক্তির দর্শন। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আত্মিক মুক্তি এবং সামাজিকভাবে মানুষের কল্যাণের যে শিক্ষা বা সাধনা, সেটাই তাঁর মানবতাবাদী দর্শন। তিনি কোন আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এটা অনুশীলন করেননি, এটা সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোমাত্রায় একজন সংসারী ও বাস্তববাদী মানুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন গভীর আধ্যাত্মিক সাধক, যার লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দার্শনিক চিন্তাধারায় এমন উপাদান রয়েছে যার দ্বারা জাতি-ধর্ম-বর্ণনিবিশেষে সব মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে লাভবান হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, তাঁর এই চিন্তার কোন প্রভাব ভারতের বাইরে অন্য কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। যদিও একাডেমিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে তাঁকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে, তবে তা খুব ক্ষুদ্র গ ির ভেতরেই আবদ্ধ। উপমহাদেশের বাইরে আধুনিক পাঠকের তাঁর সর্ম্পকে আগ্রহ অল্প। পশ্চিমে তরুণ পাঠক সমাজে তিনি বিশেষ পরিচিত নন, শুধু বাঙালির কাছেই রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য। ভারতের অন্য ভাষাভাষীর কাছে তাঁর গুরুত্ব রয়েছে কেবল জাতীয় কবি হিসাবে। তবুও বলা যায় আধুনিক সংঘাতময় সময়ে তাঁর চিন্তার অনুশীলন মানব সমাজে মঙ্গল বয়ে আনবে। আধুনিক মানুষের সব সমস্যার সমাধান তাঁর দর্শনে নেই ,কিন্তু তাই বলে তাঁর মানবতবাদী দর্শনের গুরুত্ব কমে যায় না। এখন আবেদন সীমিত হলেও পৃথিবীতে যুগে যুগে যাঁরা মানবতাবাদী চেতনার প্রতিষ্ঠা চায়, তাঁদের মনেই স্থান পাবে রবীন্দ্রনাথ। তাই দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, মানবতার প্রতি মুহূর্তের সংকট উত্তরণে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ এক জীবন্ময়ী প্রেরণার উৎস।

টীকা ও তথ্যনির্দেশঃ

১ তালুকদার, মো. আবদুল হাই, *উনবিংশ শতকে বাংলায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকা*, শরীফ হারুন (সম্পা.), বাংলাদেশের দর্শন, (৩য়), ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১৮২

২ মান্না, গুণন্ময়, *রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি*, কলকাতা, প্যাপিয়াস, ১৯৯৩, পৃ. ১-৩

৩ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,*মানুষের ধর্ম*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খ বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃ.৩৭১

৪ রায়, রামদুলাল,*বাঙালির দর্শন ঃ প্রাচীনকাল থেকে সমকাল*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃ.৩১৪

৫ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *তদেব*, পৃ.৪২৫

৬ মজুমদার, অমিয় কুমার, *রবীন্দ্রনাথের দর্শন ভাবনা*, উজ্জল কুমার মজুমদার, (সম্পাদিত) রাতের তারা দিনের রবি, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃ.২১৮

৭ *তদেব*, পৃ.২১৯

৮ *তদেব*, পৃ.২১৯

৯ মকসুদ, সৈয়দ আবুল,*রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা, প্রথমা, ২০১৩, পৃ.৭৫

১০ সেন, সুকুমার, *পরিজন-পরিবেশ রবীন্দ্র-বিকাশ*, কলকাতা,পৃ.৩৪-৩৫

১১ মকসুদ, সৈয়দ আবুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

১২ সরকার, স্বরোচিষ, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ*, প্রতীক, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, পৃ.৮৪।

১৩ সৈয়দ আবুল মকসুদ, *তদেব*, পৃ.৮৩

১৪ *তদেব*, পৃ.৮৫